কর্ম বনাম অনুগ্রহ

“হে ঈশ্বর ভীত লোক সকলে, তোমরা আসিয়া শ্রবণ কর; আমার প্রাণের জন্য তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করি” (গীতসংহিতা ৬৬:১৬) ।

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে একটি বর্ধিষ্ণু হিন্দু উচ্চবর্ণ ক্ষত্রিয় (প্রাচীনকালে রাজকার্য পরিচালনা ও যুদ্ধ বিদ্যা পেশায় যারা নিয়োজিত থাকত) পরিবারে ১৯৫২ সালে আমার জন্ম হয়েছিল । কিন্তু ১৯৭৩ সালে আমার কিভাবে নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ হয় সেই কাহিনী আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই ।

একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারে আমি বেড়ে উঠি । ছোট বেলা থেকে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন আমি পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রতিপত্তি মেনে চলতে ও বজায় রাখতে চেষ্টা করি । প্রাথমিক স্তরের স্কুলে পড়বার সময় থেকে আমার ঠাকুরদাদার কাছে দৈনিক পালনীয় পারিবারিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করা আমি শুরু করি । তখন থেকেই আমার ঠাকুরদাদার অধীনে একজন শিক্ষনবীশ হিসেবে বেদ, উপনিষদ, ভগবৎগীতা এবং হিন্দু ধর্মের অন্যান্য বই-পুস্তকগুলি আমি পড়া আরম্ভ করি । সেই বইগুলি পড়ে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, মানুষের পরিত্রাণ লাভ নির্ভর করে তার কর্মের (কাজ ও তার কাজের প্রকৃতি) উপরে । ভাল কাজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ হয় । এক জন্মের মধ্য দিয়ে যেহেতু কেউ নিখুঁত ভাল কাজ করতে পারে না সেহেতু তাকে বারে বারে সংসারের চাকায় ঘুরে পূর্ণজন্ম লাভ করতে হয় ।

এটা অনেকটা জরিমানা দেওয়ার মত । সবশেষে একদিন সকল মানুষের আত্মা পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের (সৃষ্টিকর্তা) সাথে মিশে যাবে । আর যেদিন পরমাত্মার সাথে জীবাত্মা মিশে যাবে সেদিনই হবে মোক্ষলাভ (পরিত্রাণ) । বারে বারে এই চাকায় ঘুরা বা পূর্ণজন্মে যে সব সময় মানব জনম লাভ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই । পাখী ও বিভিন্ন ধরনের জীব-জন্তু হয়েও জন্ম লাভের সম্ভাবনা আছে । যার যার কর্মফলের উপরে এটি নির্ভর করে । আমার হৃদয়ে এমন একটি ভয় উপস্থিত হয়েছিল যে, পূর্ণজন্মের এই চাকায় ঘুরার মধ্য দিয়ে আমি আমার পরবর্তী জন্মে হয়তো কোন নিকৃষ্ট জীব হয়ে জন্ম লাভ করতে পারি । এটি জানার পরে আমার অন্তরে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, কতবার জন্মের পর আমার মোক্ষলাভ হবে? কতবার আমাকে এভাবে চাকায় ঘুরতে হবে । আমি এই প্রশ্ন আমার ঠাকুরদাদাকে এবং হিন্দু ধর্মের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউ আমার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি । এরপরে আমি হতাশ হয়ে নিজের মনে প্রশ্ন করতে থাকি যে জেলখানার কয়েদীও জানে যে তাকে জেলখানাতে কতদিন থাকতে হবে । কিন্তু আমি জানিনা কতবার আমাকে সংসারের চাকায় ঘুরতে হবে এবং কতদিনে আমি পরিত্রাণ পাব । প্রায় প্রত্যেক বছরই আমার ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন হিন্দু তীর্থস্থানগুলোতে পুণ্য অর্জনের আসায় আমি যেতাম । যেখানেই আমি গিয়েছি সকল জায়গাতেই হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে আমি একটা প্রশ্নই করেছি যে, কতবার জন্মের পরে আমার পরিত্রাণ লাভ হবে । সংসারের চাকায় ঘুরে বারে বারে জন্ম লাভে আমার কোন সমস্যা ছিলনা কিন্তু আমি একটা নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম যে কতবার জন্মের পরে আমার আত্মা ব্রহ্মার সাথে মিশে গিয়ে মোক্ষলাভ করবে ।

আজ পর্যন্ত আমাদের পরিবারে বর্ণভেদ প্রথা খুব কঠিনভাবে পালন করা হয় । এই প্রথার কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে আমি বেড়ে উঠেছিলাম । দিনের পর দিন আমি লক্ষ্য করেছি নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা

কখনো আমাদের বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারত না। তাদের জন্যে বাড়ীর বাহিরে আলাদা জায়গা ছিল এবং তাদের ছোঁয়া আমাদের জন্য নিষেধ ছিল। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের অচ্ছ্যুত বলা হত। তাদের প্রতি এ ধরনের ব্যবহারের জন্য আমার মনে খুব কষ্ট হত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আমার কোন উপায় ছিলনা। আমার ঠাকুরদাদা আমাকে এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করাটা আমার জন্য ছিল আগের থেকে নির্ধারিত কারণ এই বর্ণভেদ প্রথা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ঠিক করে দিয়েছেন। একথা জানার পরে আমার মনে আরেকটি প্রশ্ন এসে দেখা দিল যে, ব্রহ্মা যদি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেন তাহলে তিনি কেমন সৃষ্টিকর্তা যে সৃষ্টির পরে মানুষের মধ্যে তিনি এই ভেদাভেদ করে দিয়েছেন। যদিও আমার উচ্চবর্ণে (ব্রাহ্মন অর্থাৎ পুরোহিত সমাজের পরে ২য় বর্ণ) জন্ম হয়েছিল তথাপি এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি আমার পক্ষে মেনে নেয়া খুব কঠিন ছিল। আমার ঠাকুরদাদার সাথে প্রায়ই বিভিন্ন ধর্ম ও সে সকলের শিক্ষা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত। একদিন খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে আমার ঠাকুরদাদাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের যে ব্যাখ্যা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তা আমি জীবনে কোন দিন ভুলবনা। তার মতে খ্রীষ্টানরা সব চেয়ে বেশী নিকৃষ্ঠ বা অসূচী কারণ তারা খাদ্য হিসাবে শুকরের মাংস ও গরুর মাংস উভয়ই খায়। খ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কে তার এই ব্যাখ্যা ছিল মূলতঃ খাদ্য-খাদকের উপরে ভিত্তি করে। তিনি এও আমাকে বলেছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে বিদেশী ও অচ্ছ্যুতদের ধর্ম। এই ধর্মাবলম্বী লোকেরা হিন্দু সমাজের নিম্ন বর্ণের লোকদের চেয়েও বেশী অচ্ছ্যুত।

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি আমার পরিবারের সাথে ভারতে শরনার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমরা একটি শরনার্থী শিবিরে ছিলাম। দিনের পর দিন আমি লক্ষ্য করতাম যে শরনার্থী শিবিরে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার তরফ থেকে খ্রীষ্টানরা এসে কিভাবে অসহায় লোকদের সেবা করছে। তাদের ত্যাগী মনোভাব ও লোকদের প্রতি তাদের সেবা-যত্নের কাজ দেখে আমার খুব ভাল লাগত। তাদের মধ্যে আমি অনেকের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলাম। একদিন আমি এ রকম এক খ্রীষ্টান সেবাকারী দলের ডাক্তারকে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছিলাম যে, যেহেতু তারা কোন ভাল কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণ পায়নি, তারা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ পেয়েছে বলে এ ধরনের ভাল কাজ তারা করতে পারছে। তারা তাদের নিজ নিজ পরিত্রাণ লাভের জন্য ভাল কাজ করছেনা। তাদের ঈশ্বর হচ্ছেন ভালবাসার ঈশ্বর এবং তাঁর সেই ভালবাসা তিনি যীশুর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। মানুষটি আমাকে আরো বলেছিলেন যে, "প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম কর" যীশুর এই শিক্ষাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে সকল মানুষের সেবা করতে সে যে ধর্ম ও বর্ণের লোক হোক না কেন। এই ধারণা ঈশ্বর ও তার ব্যক্তিস্বত্তা সম্পর্কে আমার সকল চিন্তাধারাকেই পাল্টিয়ে দিয়েছিল। এই প্রথম আমি যীশুর সম্বন্ধে জেনেছিলাম।

আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ১৯৭২ সালে আমি আমার পরিবারের সাথে ভারত থেকে দেশে ফিরে এসেছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা আমাদের বাড়ীর সহায় সম্পত্তির অনেক কিছুই হারিয়েছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধে ও শত্রুর হাতে আমাদের দেশে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল। এটি ছিল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। একদিন আমার নিজের শহরের রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটি সাইনবোর্ড আমার চোখে পড়ল। সেই সাইনবোর্ডে যে নামটি লেখা ছিল তা হল "বিশ্ব মুক্তি বাণী সংস্থা"। অনেক আগ্রহ নিয়ে আমি যে ঘরটির সামনের দেওয়ালে সেই সাইনবোর্ড ঝুলানো ছিল আমি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত সংস্থার পরিচালকের সাথে অনেক পীড়া-পীড়ির পরে দেখা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে একটি অতি সুন্দর কথা আমাকে বলেছিল যে, "ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন এবং আমিও আপনাকে ভালবাসি"। সেই

ভদ্রলোকের সাথে আমার অনেক সময় ধরে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। আমাদের আলোচনার মধ্যে আমি অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে অনেক তর্কও করেছিলাম। আমি এরপরে ঐ ভদ্রলোকের সাথে আরো কয়েকবার দেখা করেছিলাম এবং শেষে তিনি আমাকে যীশুর বিষয় বলেছিলেন। তিনি আমাকে একখানি নতুন নিয়ম দিয়ে বলেছিলেন যেন আমি বইখানি খুব আগ্রহ সহকারে পড়ি। অনেক আগ্রহ নিয়ে আমি নতুন নিয়ম পড়তে শুরু করেছিলাম। আমি আমার বিছানায় বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখে এমনকি গভীর রাতে বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে আমি বইখানা পড়তাম। বইখানি আঁকারে এত ছোট এবং পৃষ্ঠার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হিন্দু ধর্মের যে কোন বইয়ের চেয়ে কম হওয়ায় আমি দু'মাসের মধ্যেই পড়ে শেষ করেছিলাম। যদিও আমাকে বইটি অন্ততঃ দশবার পড়তে বলা হয়েছিল।

একদিন আমি রোমীয় পুস্তক পড়ছিলাম এবং রোমীয় ৬:২৩ পদ আমার অন্তরে কথা বলে। "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।" এই পদটি পড়ে আমি জানতে পেরেছিলাম যে অনন্তজীবন হচ্ছে অনুগ্রহের দান। এই জীবন লাভ করতে আমাকে কোন কষ্ট করার দরকার নেই। শুধু আমাকে এই দান গ্রহণ করতে হবে। এখান থেকেই আমাদের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

একজন হিন্দু হিসাবে আমার কাছে অনন্ত জীবন ছিল ব্রহ্মার সাথে মিশে যাওয়া এবং বারে বারে পূর্ণজন্মের মাধ্যমে তা অর্জন করা। এটি অর্জনের জন্য অনেক অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমার নিজের বাংলা ভাষায় লেখা বাইবেল পড়ে স্পষ্ট জানতে পারি এবং আমি যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজছিলাম তার উত্তর আমি বাইবেল থেকে পাই: "... দেখ এখন পরিত্রানের বিদস" (২য় করিন্থীয় ৬:২)। আমি এই উত্তরই খুঁজছিলাম। আমি এরপরে যোহন লিখিত সুসমাচার পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতভাবে নিখুঁত ও খাটি এবং যীশু ক্রুশে তাঁর জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি একজন পাপী এবং আমি যত ভাল কাজ করেছি সে সব আমার পাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে পারে না। আমি নিজে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে পারিনা। ভাল কাজ আমাকে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেনা। আমি আমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যীশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের ২০ তারিখে আমি যীশুকে আমার জীবনের প্রভু ও ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। সেদিন থেকে আমার জীবনে প্রকৃত এক আনন্দ নেমে এসেছিল কারণ যীশু আমাকে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। আমার ভিতর থেকে ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। একমাস পরে আমি আমার এই নতুন অভিজ্ঞতার কথা আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বলা শুরু করি। প্রথমদিকে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মনে করেছিল যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যখন যীশুর সম্বন্ধে তাদের কাছে বলতে শুরু করলাম এবং যীশুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তার কথা তাদেরকে বললাম তারা তখন বুঝতে পারল যে আমি খ্রীষ্টান হয়ে গেছি। এর অল্পদিন পরে আমার বাবা আমাকে তলব করে আমার এই নতুন অভিজ্ঞতার কথা জানতে চেয়েছিলেন। আমি সাহসের সাথে আমার বাবার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। খ্রীষ্টান হতে গেলে যে আমাকে অনেক মাশুল দিতে হবে আমার বাবা সে সম্পর্কে আমাকে সেদিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে মনে প্রাণে সে মাশুল দিতে প্রস্তুত ছিলাম তা আমি আমার বাবাকে স্পষ্টভাবে সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি আমার ভাই-বোনদের মধ্যে সকলের বড় ছিলাম। পরবর্তী কয়েক মাস আমাকে ভীষণ অত্যাচার এবং সময় সময় শারীরিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বাড়ীতে কাটাতে হয়েছে। অবশেষে আমার বাবা আমাকে সামাজিক ও

আইনগতভাবে ত্যাজ্য করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এটাই ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে কঠিন সময়। কোন খ্রীষ্টান আমাকে আশ্রয় দিতে সেদিন সাহস করেনি। এমনকি আমার নিজ শহরে ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর পালক আমাকে অনেকবার বাপ্তিস্ম দিতেও অস্বীকার করেন কারণ তিনি আমার পরিবারের প্রতিপত্তি ও সেই শহরে আমার বাবার প্রভাব সম্বন্ধে জানতেন। তিনি প্রথম দিকে এজন্যে আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে ভয় পেয়েছিলেন।

অবশেষে আমি বাপ্তিস্ম নিয়ে প্রকাশ্যে আমার বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলাম। এরপরেও প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ আমি আমার পরিবারের তরফ থেকে নিয়মিত হুমকির সম্মুখিন হয়েছি। এই বছরগুলো আমাকে খুবই কষ্ট ও দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে যা আমার পক্ষে ছিল খুব কঠিন। কারণ, আমি এ রকম জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমার জীবনের পরে অনেক সময় হুমকি এসেছে। কিন্তু আমার প্রভু আমাকে সব সময়ই রক্ষা করে চলেছেন এবং সবুজ ও নরম ঘাসের বিছানার উপরে যেন আমাকে শুইয়ে রাখতেন।

তিনি যে আমার কাছে আছেন আমি সব সময় এটা বুঝতে পারতাম। একদিন আমি তাঁর আহ্বান উপলব্ধি করলাম। তিনি যে আমার নিজের স্বজাতীয়দের কাছে তাঁর সুসমাচার প্রচারের জন্য আমাকে ডাকছেন তা আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। আট বছর পরে একদিন আমার বাবা আমার কাছে আসেন। আমি আমার বাবার সাথে পুর্নমিলিত হই। আমার বাবা আমাকে আমার মা ও ভাই-বোনদের দেখতে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু যতবার আমি গেছি বাড়ীর কারো কাছ থেকে আমি ভাল ব্যবহার পাইনি। আমার মা আমাকে ছুয়ে আদর করতে পারতেন না পাছে তার ভয় ছিল কারণ আমি খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানকে ছুলে তার জাত যাবে। আজ পর্যন্ত আমার গোঁটা পরিবার একটি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে। তারা ভাল কাজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার শুধু চেষ্টাই করে যাচ্ছে কিন্তু কবে তারা পরিত্রাণ পাবে তার কোন নিশ্চয়তা তাদের নেই।

আমি অনুগ্রহে ও একমাত্র যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, ভাল কাজের দ্বারা নয়। বিগত ত্রিশ বছর ধরে আমি তাদের কাছে এই কথা বলে চলেছি যারা জানেনা যে ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পরিত্রাণ এবং আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজটি করে যাবো। আমার প্রার্থনা তাদের জন্য যারা সাধ্যাতিত ভাল কাজ করার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ অর্জন করার চেষ্টা করছে তারা যেন ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ দান সম্বন্ধে জানতে পারে।